



কৃষকের অধিকার আদায়ে তেভাগা আন্দোলন: একটি সমাজতাত্ত্বিক অনুধাবন ও পর্যালোচনা

ডঃ ভাস্বতী সাহা

সহকারী আধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ

কল্যাণী মহাবিদ্যালয়, কল্যাণী

West Bengal, India

bhaswati31saha@gmail.com

সংক্ষিপ্তসারঃ

প্রাক স্বাধীনতা কালে দেশভাগের ক্ষতকে সাথে নিয়ে যে কৃষক আন্দোলন জমিদার, জোতদার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের আক্রমণের সম্মুখীন হতে সমর্থ হয়েছিল সেই কৃষক আন্দোলনের নাম তেভাগা। রাষ্ট্রের রক্তচক্ষুর বিরুদ্ধে গিয়ে জমিহীন কৃষকদের ও আধিয়ারদের দাবি আদায় এক নতুন পথ উন্মোচন করে দিনাজপুর, রংপুর ও তরাই অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলন। এই আন্দোলন মূলত আধিয়ার ও জমিহীন কৃষকদের লড়াই। ফসলের অর্ধেক নয়, উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ আধিয়ার ও একভাগ জমির মালিক পাবে, এই দাবি নিয়ে শুরু হয় তেভাগা আন্দোলন। দুই বছরের সশস্ত্র সংগ্রামে ৪১ জন কিশাণ- কিশানী নিহত হয়। বহু সমালোচনার উর্ধ্বে তেভাগা আন্দোলনের জ্বালাময় তীব্রতা ভারতের শ্রেণীবিভক্ত কৃষি সমাজের কাছে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

সাংকেতিক শব্দসূচকঃ

আধিয়ার, 'আবওয়াব', আধি, ফ্লাউড কমিশন, কৃষক সভা, ভাগচাষী, কৃষি অর্থনীতি, কর্জাধান, জমিদার, তালুকদার, কম্যুনিষ্ট পার্টি, বেগার প্রথা



ভূমিকাঃ

মোগল সাম্রাজ্যের শেষের দিকে ও ব্রিটিশ শাসনকালের প্রারম্ভে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এক যুগ পরিবর্তনের পালা শুরু হয়। সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষ আধাসামন্ততন্ত্রের দিকে বাঁক নিতে শুরু করে। মুঘল আমলের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল আমলাতন্ত্রের সুকঠিন কর ব্যবস্থা ও বিভিন্ন প্রকারে কৃষকের উদ্ধৃত্ত উৎপাদনের উপর শাসকের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজকে ভেতর থেকে ঘুণ ধরাতে পারেনি মুঘল সাম্রাজ্য। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার মৌলিকত্ব বিনষ্ট হতে শুরু করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশিক পুঁজির হাত ধরে। ব্রিটিশ রাজত্বকালের ২০০ বছরের ইতিহাস ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৭৭ টি ছোট-বড় বিদ্রোহের সাক্ষী বহন করে, তার মধ্যে প্রায় ৩০টির বেশি বিদ্রোহ সরাসরি গ্রামীণ কৃষক সমাজকে প্রভাবিত করেছিল (Gough, 1974)। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে কতগুলি কৃষক বিদ্রোহ ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিকড়কে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলার দিনাজপুর, রংপুর (অধুনা বাংলাদেশ) এবং তরাই অঞ্চলের জলপাইগুড়ি জেলার রক্তক্ষয়ী তেভাগা আন্দোলন। তৎকালীন বাংলার ২৬ টি জেলার মধ্যে বাইশটি জেলাতেই তেভাগা আন্দোলনের পরিধি বিস্তার লাভ করে। স্বাধীনতার উষ্মালগ্নে দিনাজপুরের অখ্যাত গ্রাম খাঁপুর থেকে তেভাগা আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শুধুমাত্র গ্রামের কৃষক সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক সভার নেতৃত্বে জেলার নিকটস্থ শহর ও শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর ওপর এর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার হয়। যার ফলস্বরূপ কৃষক ও শ্রমিকের সমন্বয়ে আঞ্চলিক তেভাগা আন্দোলন জাতীয় স্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবর্ণনীয় অঙ্গ হিসাবে ইতিহাসের সাক্ষী থাকে।

ব্রিটিশ অর্থনীতিতে বাংলার কৃষি শ্রেণী কাঠামোতে তীব্র বৈষম্যের চিত্রঃ

ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রারম্ভে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা দেশীয় সম্পত্তি লুণ্ঠনের প্রথম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় কৃষকের উৎপাদন থেকে সর্বাধিক উদ্ধৃত্ত নিষ্কাশনের চিরাচরিত পদ্ধতি। ১৭৬২ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে নিজামতের বাংলা শাসনে, বাংলা থেকে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল যেখানে ৬৪.৩ লক্ষ টাকা



১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আওতায় রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৮ লক্ষ টাকা। ফলস্বরূপ ১৭৭০ সালের ৭৬ এর মন্বন্তরে বাংলার এক তৃতীয় অংশ অধিবাসী প্রাণ হারিয়েছিল এবং কৃষি উৎপাদন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল (দাশ, ২০১০)। ব্রিটিশ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা আসার পর প্রথমবার ভারতের ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জমি ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় আসতে শুরু করে। জমিদার, জোরদার, গ্রামের প্রধান (ভিলেজ হেড ম্যান) প্রভৃতি জমি দখল করে নিত যদি জমির মালিক নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা দিতে না পারতো। জমির ওপর নির্ভরশীল কৃষকরা জমি থেকে উচ্ছেদ হতে থাকে। ব্রিটিশ ভারতেই কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করার আইনি ক্ষমতা পেয়েছিল জমিদাররা। এই আইনি ক্ষমতার প্রভাবে গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়, যেহেতু তারাই মুখ্য খাজনা ভোগী শ্রেণী।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকালে ভারতের অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্বঅর্থনীতির সংযোগ সুদৃঢ় হয়। সুতরাং ১৯২৯ সালের বিশ্ব অর্থনীতির মন্দার ঢেউ ভারতবর্ষের কৃষক সমাজের ওপর আঁচড়ে পড়ে। এই সময় বাংলার অসম্ভব কৃষকরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। এরই ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন গ্রামীণ কৃষকদের প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা জন্য ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে। এই কমিশন ‘ফ্লাউড কমিশন’ নামে পরিচিত ছিল। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ এর মধ্যে ফ্লাউড কমিশন একটি রিপোর্ট পেশ করে, সেই রিপোর্টে বলা হয় বাংলার শতকরা ৪৬ জনের জমি ছিল দুই একরেরও নিচে। দিনাজপুরের আধিয়াররা চাষ করতেন ১৪.৫ শতাংশ জমিতে। অন্যদিকে ১০ একরের ওপরে বেশি জমি ছিল ১৫ শতাংশ পরিবারের হাতে (চক্রবর্তী ও গুপ্ত ২০১৪), (রায়, ২০০০)। এই রিপোর্টে বাংলার গ্রামীণ ব্যবস্থার কৃষি অর্থনীতির উৎপাদন ব্যবস্থায় দুই বিপরীত শ্রেণীকে সহজেই সনাক্ত করা যায়। শ্রেণী কাঠামোর একদিকে জমিদার ও অপর প্রান্তে আধিয়ার বা ভাগচাষী ও কৃষি শ্রমিক। এই সময় ভারতবর্ষের ভূমিআইনে ভূমির কোনো উর্ধ্বসীমা বাধা ছিল না। তাই জমিদারদের ক্ষমতা প্রদর্শিত হতো গ্রামের সংখ্যা ও হাতির সংখ্যা দিয়ে।

এই রিপোর্টে আরো বলা হয় ১৯৩৮ উনচল্লিশ সালে ক্ষেতমজুরের মজুরি ছিল দৈনিক ৩ আনা। অর্থাৎ যেদিন ক্ষেতমজুরেরা কাজ পেতো সেদিন তাদের সারাদিনের আয় ৩ আনা আর যেদিন তারা কাজ খুঁজে পেত



না সেদিন তাদের কোন আয় হতো না। বছরের হিসাবে দেখা গেছে বাৎসরিক তাদের খুব বেশি হলে ৮ মাস কাজ জুটতো। ব্রিটিশ আমলে কৃষক ব্যবস্থার শ্রেণীবিন্যাসে সবচেয়ে উপরে ছিল ব্রিটিশ সরকার। এর পরবর্তী স্তরে যথাক্রমে জমিদার, তালুকদার, জোরদার, পাওনিদার এবং এরপরেও থাকে বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্থত্বভোগী যাদের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ পর্যন্ত থাকতো। এই সকল স্তরের করের বোঝার হিসাব মেটানো হতো সংখ্যাগুরু ছোট কৃষকদের, ক্ষেতমজুর ও সর্বোপরি ভাগচাষী বা আধিয়ারদের। ফ্লাউড কমিশন দাবি করে দিনাজপুরের কৃষকদের মধ্যে ১৩.৮ শতাংশ ছিল ভাগচাষী আধিয়ার। কিন্তু অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে ভাগচাষীর সংখ্যা ৬০ শতাংশেরও বেশি ছিল। এর সাথে যুক্ত ছিল ক্ষুদ্র চাষী যাদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি ছিল না, যা থেকে তাদের প্রতিদিনের পারিবারিক চাহিদা মিটতে পারে (রায়, ২০০০)।

আধিয়াররা সারা বছর জমিদার, জোতদার বা সামন্ত প্রভুদের জমি চাষ করত। জমির মালিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মূলধন নিয়োগ বলতে শুধুমাত্র তাদের জমি। বাদ বাকি কৃষি সংক্রান্ত খরচ যেমন সার, বীজ, হাল চালাবার গরু, জল সেচের ব্যবস্থা, এবং কৃষির যন্ত্রপাতি (লাঙ্গল, কাস্তে, নিড়ানি ইত্যাদি) প্রভৃতি উৎপাদন সামগ্রী আধিয়ারদের কাঁধেই ন্যাস্ত ছিল। এইসবের সাথে যুক্ত ছিলো আধিয়ারদের নিজস্ব শ্রম ও পারিবারিক শ্রম। আধিয়ারদের শ্রমে উৎপন্ন ফসল মালিকদের গোলায় তুলে দিতে বাধ্য হত। জোরদাররা আধিয়ারদের এর কাছ থেকে 'সেলামি' ও 'আবওয়াব' নিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'খোলানি'- আধিয়ারদের স্থানান্তর থাকার জন্য উৎপাদিত শস্য জোরদারদের জায়গাতেই মজুত করে মাড়াই করতে হতো। সেই জায়গার ভাড়া 'খালানি' বলে। আবার খালানি পরিস্কার করার জন্য মজুরি স্বরূপ 'ঝাড়ুদারি' দিতে হতো। এইভাবে আদিয়ারের প্রাপ্য ফসল থেকে তহরী, মার্চা, মহলদারি, বরকন্দাজি, গোলাপূজা, হাতিখোয়া, মাছখোয়া, সন্ধ্যাসী, গাজন, থিয়েটার প্রভৃতি বিভিন্ন নামে সারা বছর ধান কেটে নেওয়া হতো। এরপর ছিল 'কর্জাধান' শোধ। জোরদাররা তাদের জমিদারির পাশাপাশি মহাজনি কারবার করত। আধিয়ার যে ফসল ঘরে তুলতো, তা দিয়ে পরিবারের ভরণ পোষণ তিন থেকে চার মাসের বেশি হতো না। তখন তাদের বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছ থেকে ধান সুদসহ 'কর্জা'



নিতে হত। কিংবা অনেক সময় আধিয়ারকে অনেক বেশি বাজার মূল্যে ধান কিনে নিতে হত সেই মহাজনদের কাছ থেকে। নতুন ধান ঘরে আসলে পুরানো কর্জা সুদ সহ মেটাতে হত।

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে বাংলার বর্গাদারদের 'তেভাগা' সুপারিশ করেছিল ও বাংলাদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে রাইতওয়ারী প্রথা চালু করা হবে। পরবর্তীকালে এই কমিশন সমালোচনায় বিদ্ধ হয়। সমালোচকরা বলেন কৃষক বিক্ষোভের কারণে এই কমিশন গড়ে তুললেও গরিব কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার দায় এই কমিশনের ছিল না।

১৯৩৯ সালে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে দিনাজপুর অঞ্চলে 'তোলাবাটি' আদায় গরিব নিরন্ন চাষী ও সাধারণ মানুষের ওপর আরেকটি অত্যাচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। দিনাজপুরের মেলায় ও হাটে 'তোলাবাটি' খাজনা জমিদার ও জোরদারদের আরেকটি লুটের উৎস ছিল। সাধারণ তরি- তরকারি ও সবজি থেকে শুরু করে গরু- মহিষ- ছাগল কেনা বেচার জন্য প্রতিহাটে খাজনা জমিদারের লাঠিয়ালদের হাতে তুলে দিত।

আন্দোলনে কৃষক সামিতির অবদান:

তেভাগা আন্দোলনে এক বড় ভূমিকা ছিল বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কৃষক সমিতির। কৃষক সমস্যার সামগ্রিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে রায়তদের নিজ স্বার্থে গড়ে উঠেছিল কৃষক সমিতি, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতে কৃষকদের আন্দোলনকে সঠিক দিক নির্দেশ করা। সমসাময়িক যেকোনো কৃষক আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়ে দিয়ে জনস্বার্থ বিরোধী দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়াই ছিল সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পরিস্থিতিতে কৃষকরা নিজেদের স্বার্থে গড়ে তুলেছিল কৃষক সমিতি। ১৯২১ সালে নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার কাপাসডাঙ্গা গ্রামে প্রথম কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসাহেব গ্রামে। ১৯৪০ সালে পাজিয়া সম্মেলন ই (যা বাংলাদেশের যশোর জেলার পাজিয়া গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়) হল তেভাগা আন্দোলনের উষালগ্ন। 'পাজিয়া' সম্মেলনের মধ্য দিয়েই বর্গাদার বা আধিয়ার ও খেতমজুরদের সামাজিক অর্থনৈতিক শোষণের বিষয়টি আলোকপাত করে তাদের অর্থাৎ

আধিয়ারদের দুই - তৃতীয়াংশ ফসলের দাবি দিয়ে তেভাগা আন্দোলনের পথরেখা সূচিত হয়। কিন্তু আন্দোলন কোথায়, কিভাবে হবে তা নিয়ে কোন পথনির্দেশ এই সম্মেলন থেকে উঠে আসেনি। এর পরবর্তীকালে পঞ্চম প্রাদেশিক সম্মেলন 'ডোমার' (১৯৪২) ও পরবর্তী সময়ে 'ললিত বাড়ি' (১৯৪৩) সম্মেলনে ভাগচাষীদের দাবি আরো স্পষ্টভাবে দানা বাধে। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে ছিল 'উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের একভাগ জমির মালিককে দেওয়া হইবে এই ভিত্তিতে সমগ্র ভাগ চাষীদের সংঘবদ্ধ করা' এবং এর সাথে 'আবওয়াব' দের বিলোপ সাধনের কথা বলা হয়। অর্থাৎ 'পাজিয়া' সম্মেলনের তেভাগা আন্দোলনের বীজ, 'ললিতবাড়ি' সম্মেলনে সাংগঠনিক দৃঢ়তা অর্জন করে। তবে পাশাপাশি এটাও মনে নিতে হবে যে, 'ললিতবাড়ি' সম্মেলনে বর্গাদারদের প্রজাস্বত্ব অধিকার নিয়ে কোনো পরিষ্কার দাবি তোলা হয়নি।

কৃষক সমিতির দাবি ও আধিয়ারদের সংগ্রামের পথকে আরো দৃঢ় করেছিল বাংলার কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র সংগঠন। ক্ষুদ্র কৃষক, আধিয়ার ও কৃষি শ্রমিক এদের মনের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধেছিল কিন্তু সেটি নিপীড়িত কৃষককুলকে শোষণের বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে এক ছাতার তলায় আনা ছিল প্রাথমিক কাজ। যেকোনো আন্দোলনের এক বড় প্রস্তুতি থাকে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহার এবং আন্দোলনের সঠিক দিক নির্ণয় করা।

১৯৪৪ সালের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে পার্টি সদস্যদের মধ্যে তেভাগা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এর পূর্বেই বিশেষ করে দিনাজপুরের কৃষক সমিতি কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে লিফলেট বিলি করার শুরু করেছিল। লিফলেট এর মধ্য দিয়ে কৃষকদের দুরবস্থা তাদের প্রকৃত শ্রেণী শত্রুকে চেনা, ও শত্রুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান ছিল। বিভিন্ন সভা, সমিতি, মিটিং, মিছিল প্রকৃতির মধ্য দিয়ে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি হতে থাকে। কৃষক সমিতির কর্মী ও পার্টি কর্মীরা তাদের নিরবিচ্ছিন্ন জনসংযোগের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন নিপীড়িত কৃষি-শ্রমিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও সর্বোপরি আধিয়ারদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা আনতে বদ্ধপরিকর হন অন্যদিকে গ্রামের নিরন্ন সাধারণ মানুষদের সাথে পার্টি কর্মীদের যোগাযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে



গ্রামের কৃষকদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও তাদের সমস্যা আরো প্রকটভাবে পার্টি কর্মীদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে ধরা পড়ে। পার্টির আদর্শের তত্ত্ব ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির মিলিত সমন্বয়ে তেভাগা আন্দোলনের দাবিগুলি উঠে আসে।

তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল নিম্নরূপ-

১. জমিতে উৎপন্ন ফসল কে সমান তিন ভাগে ভাগ করতে হবে। তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে আধিয়ার ও একভাগ পাবে জমির মালিক। যদি জমির মালিক চাষ সংক্রান্ত বিভিন্ন খরচের ভাগ বহন করে, তবেই ফসলের অর্ধেক পাবে।
২. জমি পতিত ফেলে রাখা যাবে না, ভূমিহীন ও গরিব কৃষকদের চাষের জন্য দিতে হবে।
৩. হাটে- বাজারে তোলাবাজি জুলুম বন্ধ করা।
৪. বেগার প্রথা বন্ধ করা।
৫. করযা ধানের সুদ বন্ধ করা।
৬. গরিব চাষীদের কাছ থেকে সেলামি নেওয়া চলবে না।
৭. আধিয়ারকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবেনা।
৮. আধিয়ারকে নিজের খামারের ধান তুলতে দিতে হবে।
৯. রসিদ দিয়ে তবেই ভাগচাষীদের কাছ থেকে ধান নিতে হবে।
১০. সকল প্রকার আবায়াব বন্ধ করতে হবে।

এই দাবিগুলোকে সামনে রেখে তেভাগা আন্দোলনের স্লোগান ওঠে - 'আধি নাই তেভাগা চাই', 'করজা ধানের সুদ নাই', 'নিজ খোলানে ধান তোলো', 'জান দেবো তবু ধান দেবো না' 'তেভাগা আইন চালু করো' ইত্যাদি।

এই আন্দোলনের সূচনা হয় দিনাজপুর জেলার গ্রামগুলিতে। সাংগঠনিক প্রস্তুতি হসাবে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক



বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়েছিল। এই বাহিনীর এক বড় অংশ ছিল দরিদ্র কৃষকরা। গ্রামের জোতদারদের ভাড়াটে লাঠিয়াল ও পুলিশদের প্রতিরোধ করা। আন্দোলনের অর্থসংগ্রহের জন্যে স্লোগান ওঠে ‘এক ভাই, এক লাঠি, এক টাকা’।

আন্দোলনের গতি- প্রকৃতি ও বিস্তার:

১৯৪৬ সালের আইনসভা নির্বাচন তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে ঘৃতাছতি দেয়। এই নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি সাধারণ কৃষক ঘরের ছেলে রূপনারায়ণ রায়কে দাঁড় করায় কংগ্রেসের বিপক্ষে। এই লড়াই শুধু নির্বাচনী লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ ছিলনা, এই লড়াই ছিল শ্রেণীদ্বন্দ্বের লড়াই। একদিকে কংগ্রেসের সাথে জমিদার, জোতদার, মুসলমান জোতদার, মুসলিম লীগ, শহরের অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি উচ্চবিত্ত শ্রেণি। অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আধিয়ার, ছোট কৃষক শ্রেণি যারা বেশির ভাগই রাজবংশী, ক্ষত্রিয়, সাঁওতাল, আদিবাসী পলিয়া অর্থাৎ সমাজের নিচু জাতের ও নিচু শ্রেণীর ও দরিদ্র মুসলমান চাষীরা একজোট হয়ে রূপনারায়ণের পাশে দাঁড়ায়। নির্বাচনের রূপনারায়ণ রায়ের অভূতপূর্ব সাফল্য কৃষকদের দাবি আরো মজবুত করে ও আন্দোলনের গতি আরো ত্বরান্বিত করে। এই আন্দোলনকে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় পরিণত করা শত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়।

এই আন্দোলনের এক অগ্নিগর্ভস্থান হিসাবে দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন গ্রামগুলি চিহ্নিত হয়। সাংগঠনিক প্রস্তুতি হিসেবে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর এক বড় অংশ ছিল নিপীড়িত দরিদ্র কৃষকেরা। এদের প্রধান দায়িত্ব ছিল গ্রামের জোতদারদের লাঠিয়াল ও পুলিশদের প্রতিরোধ করা ও গ্রামে গ্রামে মানুষদের আগাম সচেতন করা।

১৯৪৬ সালে জানুয়ারি মাসের ধান কাটার সময় রাজবংশী সাঁওতাল ও গরিব মুসলমান জোতদার আধিয়াররা ধান কেটে নিজ খোলানে ধান তুলতে শুরু করলে স্বাভাবিকভাবে জমিদারদের ভাড়াটে লাঠিয়াল দ্বারা কৃষকরা আক্রান্ত হয়। কিন্তু লাঠিয়ালরা শত প্রণোদিত পুরুষ ও মহিলা ভলেন্টিয়ারদের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। এই আন্দোলনে মেয়েদের একটি বড় ভূমিকা ছিল। হাজার হাজার মেয়েরা জমির চারিদিকে দা, কুড়ল, বাঁটা,



ঝাড়ু নিয়ে পুলিশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা লড়াই এর কেন্দ্রবিন্দু থেকে দুই থেকে তিন সাপ্তাহের মধ্যে ৩০ টি থানার ২২ টিতেই আন্দোলনেরও আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আন্দোলনকে সঠিকভাবে কার্যকর করার জন্য সমগ্র দিনাজপুরজেলাকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়। এই অঞ্চলগুলি যথাক্রমে ঠাকুরগাঁও পূর্বাঞ্চল -নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড বিভূতি গুহ ও অজিত রায়, ঠাকুরগাঁও পশ্চিমাঞ্চল - নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড গুরুদাস তালুকদার, চিরিরবন্দর অঞ্চল- নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড সুধীর সমাজপতি ও শচীন্দ্র চক্রবর্তী, ফুলবাড়ি ও পতিরাম অঞ্চল - নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড কালী সরকার ও রূপনারায়ণ রায়, ইটাহার অঞ্চল- দায়িত্বে কমরেড বসন্ত চ্যাটার্জি, সেতাবগঞ্জ অঞ্চল - দায়িত্বে ছিলেন কমরেড জনার্দন ভট্টাচার্য।

ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চলে ঠুমনিয়া গ্রামের প্রথম ধান কাটা শুরু হয়। প্রথম দিন ধানকাটা নির্বিঘ্নে শেষ হলেও, পরবর্তী দিনে ২২ জন কৃষক কর্মীসহ, জেলা পার্টি সম্পাদক কমরেড সুনীল সেনকে পুলিশ ধান চুরির অপরাধে গ্রেপ্তার করে এবং সমগ্র গ্রামকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ঘিরে রাখে। কিন্তু কৃষকেরা নিজেদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখে ধান কাটা কাজ করতে থাকে। এরপর সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কৃষক ভলেন্টিয়ারদের সরাসরি ধান কাটায় বাধা দেয়। পুলিশ বাহিনী প্রথমে সরাসরি মাঠে না নেমে, পরোক্ষভাবে হাজার হাজার কৃষক কর্মীদের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। গ্রামের জমিদার জোরদারেরা সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং জেলা শাসক ও মহকুমা শাসকদের সহায়তায় আধিয়ারদের সাথে এক মধ্যস্থতায় আসতে চায়। কিন্তু অন্যদিকে কৃষক কর্মীরা কোন প্ররোচনায় পা না দিয়ে ধান কাটার কাজ শেষ করতে থাকে। ফলস্বরূপ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর কাছে কৃষকরা সম্মুখ সমরে নামতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ জানুয়ারি দিনাজপুর শহরের কাছে চিরিরবন্দর এলাকায় তালপুকুর গ্রামে আন্দোলনরত কৃষকদের ওপর প্রথম গুলি চালায় পুলিশ বাহিনী। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েন সাঁওতাল আধিয়ার শিবরাম ও ক্ষেত মজুর সমিরউদ্দিন। তেভাগা আন্দোলনের প্রথম দুইজন শহীদ। অনেক আন্দোলনরত মানুষ গুলিতে আহত হন। একজন সশস্ত্র পুলিশও আন্দোলনকারীদের তীরে বিদ্ধ হয়ে হয়ে মারা যান।



আন্দোলনের ভয়াবহ রূপের কাছে নতিস্বীকার করে তৎকালীন লীগ সরকার তেভাগা সংক্রান্ত একটি বিল পেশ করতে যাচ্ছে এরূপ একটি সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বিলের খসড়াও বাইশে জানুয়ারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। ফলস্বরূপ অসংগঠিত আধিয়ারদের ভীত - সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল এই ভিত্তিতে যে, এখনো পর্যন্ত তারা জমিদারের খোলানেই ধান তুলেছিল, পরবর্তীকালে আইন থাকলেও তারা আর জমিদারের খোলান থেকে নিজেদের প্রাপ্য ধান ঘরে তুলতে পারবে না। এই আশঙ্কা নিয়ে দলে দলে অসংগঠিত কৃষকরা কৃষক সমিতির কাছে আসতে থাকে ও কৃষক সমিতির সহায়তায় 'খোলান ভাঙ্গা' অভিযানে সামিল হয়, এভাবে আন্দোলনের নতুন গতিপথ সৃষ্টি করে। কৃষক সভার স্লোগান 'এক লাঠি এক মানুষ এক টাকা' অসংগঠিত আধিয়ারদের উজ্জীবিত করে এবং আধিয়ারা সংগঠিত হয় নিজেদের দাবি ছিনিয়ে আনার। নতুন নতুন এলাকা, খোলান ভাঙ্গা আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হতে থাকে। গ্রামের হাজার হাজার আধিয়ার ও গরীব কৃষকরা কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় জমিদারের খোলান থেকে ধান নিজখোলানে নিয়ে আসতে থাকে। বালুরঘাট মহাকুমার পতিরাম খাঁপুর অঞ্চলে আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি তৈরি হয়। কৃষক সমিতির স্বেচ্ছাসেবক ক্ষুদ্র কৃষক ও আধিয়ারদের সাথে বচসায় জমিদার প্রশাসন ও পুলিশের সহায়তা নেয়। এরপরে আন্দোলনের পুরো ভাগে থাকা কৃষনদাস মোহন্তসহ ১৫ জন আন্দোলনকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশরা সাঁওতালদের তীর ধনুক দ্বারা আক্রান্ত হয়। পুলিশ ও কৃষকদের সম্মুখ সমরের চিয়ারসাঁই শেখ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা নীলকণ্ঠ দাসকে খুঁজে না পেয়ে তার স্ত্রী যশোদা দেবীকে গুলি করে হত্যা করে। সরকারি খতিয়ান অনুযায়ী ঠাকুরের এই খন্ড যুদ্ধে পুলিশের ১২১ রাউন্ড গুলি খরচ হয় এবং তাহাতে মোট ২২ জন বিপ্লবের মৃত্যু হয়। এই ২২ জনের মধ্যে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান ১৬ জন ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় ছয়জনের। পুলিশের সৈরাচারিতার এক বর্বর নিদর্শন পরদিন ঠাকুরগাঁও পশ্চিম অঞ্চল থুমনিয়াতে পাওয়া যায়। সেখানে পুলিশের গুলিতে নিহত হন কমরেড শুকুর চাঁদ সিং ও তার স্ত্রী শনিমা সিংহ সহ আরো ৪ সহযোগী। দিনটি ছিল ২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭। অন্যদিকে আবার চিরিরবন্দরে গাজন বর্মণ ও ঝড়ু বর্মণ নিহত হন পুলিশের গুলিতে। ঠাকুরগাঁও শহরে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আর শান্তিপূর্ণ সমাবেশ আয়োজন করা হলে, সেখানেও পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। এবং তাৎক্ষণিক



সেখানে প্রাণ হারায় পাঁচজন কৃষক। শুধু তাই নয়, ডাক্তার-ছাত্র- বুদ্ধিজীবীদের দল এই আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, তারাও বাধাপ্রাপ্ত বলেন পুলিশের দ্বারা। জেলা ও আঞ্চলিক নেতাদের বাড়ির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে থাকে। চলতে তাকে বাড়ি বাড়ি হানা, গ্রেফতার এবং অকথ্য অত্যাচার। জেলে বন্দি অবস্থায় প্রাণ যায় সংগঠক গঙ্গাধর বর্মণ খগেন রাজবংশী চেরু বর্মণ, গোবর্ধন বর্মণের। জোরদারদের অত্যাচারে নিহত হন খাঁপুরের আর একজন কৃষক কর্মী ও যমুনা দাস নামে একজন কৃষাণী।' (রায়, ২০০০), (সেন ২০১০)।

এই আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো মহিলাদের অংশগ্রহণ। ১৯৩৮ - ৩৯ সালে তোলাবাজী আন্দোলন থেকে শুরু করে তেভাগা আন্দোলনের শেষদিন পর্যন্ত গ্রামীণ কৃষক মহিলাদের অসামান্য অবদান অনস্বীকার্য। প্রধানত পরিবারের মহিলাদের দ্বারা উৎপন্ন শাকসবজি যা নিয়ে মহিলারাই হাটে বিক্রি করতে আসতো। সুতরাং বেআইনি তোলা বা লেখাই আদায়ের ক্ষেত্রে মহিলাদেরই বেশিরভাগ পৰ্য্যুদন্ত হতে হত। তেভাগার মূল পর্বে মেয়েরা ভলেন্টারি বাহিনীতে নাম লেখাতে, মিটিং মিছিলে যোগদান করতে শুরু করেন। আন্দোলন চলাকালীন ধান কাটতে যেমন মহিলারা মাঠে নামতেন তেমনি সেই ধান পাহারা দেবার জন্য পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বটি, ঝাঁটা, লাঠি, দা, কুড়োল, ধান ভাঙ্গার গাইতি নিয়ে বিনিদ্ধ রজনী ধান পাহারা দিতেন। জমিদারদের লাঠিয়াল বা পুলিশের আগমনের সংবাদ মেয়েরাই উলু ধ্বনি- কাসর- ঘন্টা -শঙ্খ বাজিয়ে অথবা কখনো 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'ধ্বনি দিয়ে গ্রামকে সজাগ করে দিত। সব রকম বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে গোপন সংবাদ প্রেরণ থেকে শুরু করে পুলিশের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া প্রভৃতি সশস্ত্র আন্দোলনের এক বিরাট অংশের দায়িত্বভার মহিলারা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

৩৫ টি পুলিশ ক্যাম্প এর সাহায্যে এই কৃষক বিদ্রোহকে করা হাতে দমন করার চেষ্টা করা হয়। প্রায় দুই বছরের ধারাবাহিক কৃষক সংগ্রামে, নিজেদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে ৪১ জন কিসান - কিসানি শহীদ হয়। দশ হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হন। গ্রেপ্তার হন ১২০০ এরও বেশি কৃষক, কৃষক সমিতির সদস্য, কমিউনিস্ট পার্টি কর্মী (যে সমস্ত কর্মীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন)।



তেভাগা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা বা সমালোচনাঃ

তেভাগা আন্দোলনে শ্রেণী চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলে স্বল্প জমির মালিকদের অবস্থান ছিল দোদুল্যমান। স্বল্প জমির মালিকদের নিজস্ব যা জমি ছিল তাতে তাদের পরিবারের শ্রম দিয়েই ফসল উৎপন্ন করত। প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় কৃষক শ্রমিক ভাড়া নিত। সেই কারণে আদিয়ারদের দাবিগুলি খুব বেশি প্রয়োজন তাদের জন্য ছিল না। এই মাঝা-মাঝি পরিস্থিতিতে নিজেদের স্বল্প জমি বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অনেকটা দিশেহারা হয়ে জমিদার ও জোরদারদের পক্ষ অবলম্বন করে।

সঠিকভাবে নেতৃত্বদানের অক্ষমতা ছিল এই আন্দোলনের আরেকটি বড় সীমাবদ্ধতা। গরীব দিনমজুর ও বর্গাদারদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সঠিক দিশা দেখাবার জন্য নেতৃত্বের অভাব ছিল। আন্দোলনকারীদের বাধাহীন স্বতঃস্ফূর্ততা ও সামগ্রিক রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব আন্দোলনকে সাফল্যমন্ডিত করতে পারেনি। সমালোচকদের মতে কৃষক সভার নেতৃবৃন্দের মধ্যে মধ্যবিত্ত কৃষক ও শহরে বুদ্ধিজীবীদের প্রাধান্য ছিল। রাজ্য নেতৃত্ব ও আঞ্চলিক নেতৃত্বদের মধ্যে পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এবং আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ততা আন্দোলনের গতিরুদ্ধ করেছিল। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, জমিদারদের শস্যভান্ডার কী করে পুনরুদ্ধার করা যায় তা নিয়ে আঞ্চলিক নেতাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। অনেক নেতরাই এই রক্তক্ষয়ী লুণ্ঠপাটের পক্ষে ছিলেন না। আবার অন্যদিকে বর্গাদারদের প্রজাস্বত্ব অধিকার নিয়ে কোনো আলোচনা করা হল না বা কোনো দাবি তোলা হল না যখন 'ফ্লাউড কমিশন' এর এ নিয়ে একটি সুপারিশও ছিল।

উপসংহারঃ

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দেশভাগের যন্ত্রণাকে বয়ে নিয়ে বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের হাত ধরে ভারতের কৃষি অর্থনীতির বিরাট পরিবর্তন এসেছে। তবু আজও অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্ক,



কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা এবং উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান খরচের ভার। ঋণগ্রস্ত কৃষকেরা আজও নির্ভরশীল সুদখোর মহাজনদের উপর। এখনো গ্রামাঞ্চলে ক্ষেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশ। ন্যাশনাল ক্রাইম রিপোর্ট ব্যুরোর রেকর্ড (২০২২) অনুযায়ী গোটা দেশে গড়ে দিনে ১৫৪ জন কৃষক, দিনমজুর আত্মহত্যা করছেন। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের অধিকার বুঝে নেবার সংগ্রাম চলছে নিরন্তর। প্রাক স্বাধীনতা কালে কৃষকদের সমস্যা ও সংকট আজও ভারতের কৃষি সমাজ ব্যবস্থায় অমলিন। রাষ্ট্রযন্ত্রের চালিকাশক্তি দ্বারা অবদমন, সুযোগ্য নেতৃত্বগের অভাব অথবা সমকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হতে পারার ব্যর্থতা ইত্যাদি যাই হোক না কেন, বহু সমালোচনার উর্ধ্বে গিয়েও সমাজের 'নিম্নবর্গ' মানুষ বলে যারা পরিচিত অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সামাজিক স্তরবিন্যাসে যাদের স্থান নিচের সারিতে সেইসব 'নিম্নবর্গের' মানুষদের তৈরি রচিত এই তেভাগা আন্দোলন রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করে চলছে।



তথ্যসূত্র

- রায়, ধনঞ্জয়. ২০০০. *দিনাজপুর জেলার ইতিহাস*, কলকাতা: কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানি.
- হোর, সোমনাথ. ২০১০. *তেভাগার ডায়েরি ও চা বাগিচার কড়চা*, কলকাতা: সুপর্ণরেখা.
- রায়, ধনঞ্জয় (সম্পাদনা). ২০০০. *তেভাগা আন্দোলন*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড.
- পাল, চিত্তরঞ্জন (সম্পাদনা). ২০১১. *তেভাগার নারী*, কলকাতা: র্যাডিক্যাল.
- ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ও শুভাশিসগুপ্ত ২০১৪. *দিনাজপুর (১৭৫৭-১৯৪৭)*, কলকাতা: ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ও শুভাশিসগুপ্ত.
- রসুল, আব্দুল্লা. (১৯৬৯). *কৃষক সভার ইতিহাস*, কলকাতা: নাবজাতক প্রকাশক.
- দাশ, চিত্তরঞ্জন. (২০১০). *পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি*, কলকাতা: এম এল আর সি
- সেন, সুশীল. (2010, September 13). *অবিস্মরণীয় তেভাগা সংগ্রাম ও দিনাজপুর*. বাঙালি নামা.
<https://bangalnama.wordpress.com/2010/09/13/abismaraniyo-tebhaga-sangram-o-dinajpur/> accessed on 14.01.2026
- Bandyopadhyay, D. 2001. "Tebhaga Movement in Bengal: A Retrospect", *Economic and Political Weekly*, 13-19 October. Pp. 3901-3907.
- Das, Susanta. 2008. "Ideology and Organisations of Rural Protest: Present Movement in Bengal (1946-49)", *Proceedings of History Congress* Vol. 69, pp. 674-690



- Das, Susanta. 2013. "Marginal Communities in Peasant Movement: The Sharecroppers' Struggle for 'Tebhaga' in North Bengal (1946-47)", *Proceedings of History Congress* Vol. 74, pp. 640-651.
- Gough, Kathleen. 1974. "Indian Peasant Uprisings", *Economic and Political Weekly*, vol. 9, October. Pp. 1391-1412.